দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 16 NOV 1994
পৃষ্ঠা ... ৫

'৯৪-এর এসএসসি পরীক্ষার ফল ॥ একটি পর্যালোচনা

ছাত্রদের স্কুল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক একজামিনেশনের ফল প্রকাশে এবার ব্যাপক অনিয়ম, মারাত্মক ভুলত্রুটি এবং অসঙ্গতি ধরা পড়েছে— যা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর পত্র-পত্রিকায় কমবেশি প্রতিবারই লেখালেখি হয়ে থাকে। কিন্তু এবার ফল প্রকাশের দিন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সবক'টি প্রভাবশালী পত্রিকায় চিঠিপত্র, রিপোর্ট এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। অসঙ্গতি এবং ভুলত্রুটির কারণে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, স্কুল ও অভিভাবককে যে বিস্তর মাসুল দিতে হবে— এ কথা বলাই বাহুল্য। ছাত্র-অভিভাবকদের প্রত্যাশা ছিল কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে দ্রুত এবং নির্ভুল ফল পাওয়া যাবে। অথচ ফলটা হলো উল্টো। তবে কি তাড়াহুড়ো করেই পদ্ধতি পরিবর্তনে বাধা দিলে ভাল হতো। সময় নিয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজটা শুরু করাই কি উত্তম ছিল না?

মীর মোস্তাফিজ আহমদ

গুরুতর অসঙ্গতিপূর্ণ ঘোষিত ফলের মধ্যে চমকপ্রদ ছিল মৃত ছেলেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ঘোষণা। ঢাকা বোর্ডের অধীন জামালপুরের কামালখান হাই স্কুলের ৬৬৭৯৩৪ রোল নম্বরধারী ছাত্র পরীক্ষার ১৭ দিন আগে আত্মহত্যা করলেও ফল প্রকাশের পর দেখা যায় সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে কি আত্মহত্যা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা? একই বোর্ডের ৬৩৬৪৩৮ রোল নম্বরধারী প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী যথারীতি প্রতিদিন পরীক্ষা দিলেও তাকে ফলাফলের শীটে বহিষ্কার দেখানো হয়েছে (অবজারভার ২৬/৯/৯৪)।

ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের ফার্স্ট বয় সাইফুর রহমান বাকাউল এখন পর্যন্ত সম্ভবত একমাত্র 'ভাগ্যবান' ছাত্র যাকে ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ফলে 'ফেল' দেখানো হলেও পরে মেধা তালিকায় সম্মিলিতভাবে ১৯তম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে (জনকণ্ঠ ২৫/১০/৯৪)। ধন্যবাদ কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে। তিনি ১৮ অক্টোবর এক ঘোষণায় সংশোধনী দেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল এবং পদাধিকারবলে ক্যাডেট কলেজসমূহের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আমিন আহমদ চৌধুরী ঘোষিত ফলাফল সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব এবং সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি ক্যাডেট কলেজের ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং প্রসঙ্গত ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ফার্স্ট বয় মাত্র ২৮ নম্বর পেয়ে অকৃতকার্য হওয়ার দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেন। তাঁর অভিযোগের ফিরিস্তি ১৭ অক্টোবর বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফিরিস্তি প্রকাশের পর পর ফার্স্ট বয়ের সংশোধিত ফল প্রকাশ করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, ঐ ছাত্রের অন্য যে সব বিষয়ের নম্বরে অসঙ্গতি ছিল সেগুলো সংশোধন করার দাবি পরিত্যাগের বিনিময়ে অভিভাবককে ঐ উপহার দেয়া হয়।

মেজর জেনারেল আমিন আহমদ চৌধুরী মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট স্থানে দেয়া তাঁর দীর্ঘ আবেদনে যে সব তথ্য তুলে ধরেছেন (বাংলাবাজার পত্রিকা ১৭/১০/৯৪) সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের ছাত্র শাহজাহান চৌধুরী ভূগোল রচনামূলক অংশে ৫০ নম্বরের মধ্যে 'শূন্য' পেয়েছে। সিলেট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র সৈয়দ ইমদাদুল ইসলাম বাংলা প্রথমপত্রের রচনা অংশে মাত্র ৯ এবং ইসলাম ধর্ম অংশে ১৯ পেয়েছে। অথচ নৈর্ব্যক্তিক অংশে উভয় বিষয়ে পেয়েছে ৫০-এর মধ্যে ৫০।

অনুরূপ অভিযোগ এসেছে গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের কয়েকজন মেধাবী ছাত্রের অভিভাবকের পক্ষ থেকে। এসব ছাত্র স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় ১-২০ তম স্থান অধিকার করে। এদের মধ্যে ফার্স্টবয় বিজ্ঞান ২য় পত্রে ৪০-এর মধ্যে ২৬, ৩য় স্থান অধিকারী ছাত্র বাংলা ২য় পত্রের রচনামূলক অংশে ৫০-এর মধ্যে ১৬ পেয়েছে। অপর ছাত্র ভূগোল নৈর্ব্যক্তিকে পেয়েছে শূন্য (ইত্তেফাক ১২/১০/৯৪)।

এবারই স্মরণাতীতকালের মধ্যে বোর্ড থেকে স্কুলে টেবুলেশনের শীট পাঠান হয়নি। যা উল্লেখ করা হয়েছে তা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং অভিভাবকদের নিকট থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই দেয়া। একবার টেবুলেশন শীটের দেখা পাওয়া গেলে—আমি নিশ্চিত তালিকা বৃদ্ধির ভয়ে আমার পক্ষে এ লেখা তৈরি করা সম্ভব হতো না। তবুও লেখাটি তৈরির উদ্দেশে আমি বিপুল সংখ্যক পাস করা ছাত্র, তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকের সাথে কথা বলেছি। ছাত্রদের মধ্যে অনেকে বলেছে, তারা কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারছে না কি করে নম্বর এত ওঠা-নামা করতে পারে। কোন কোন ছাত্র বলেছে, তারা আশাতীত নম্বর পেয়েছে, কেউ কেউ বলেছে, এত কম নম্বর তারা কখনও আশা করেনি। নম্বর কমবেশি পাওয়া কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, তবে এবার অভিযোগটি এত বেশি যে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা দরকার, এর একটা বিহিত করা উচিত। একজন অভিভাবিকা বলেছেন, তাঁর ছেলে ভূগোলে অনুমানের ওপর গোল্লা ভরাট করেছে বলে পরীক্ষা দিয়ে জানিয়েছে কিন্তু ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেছে সে তার অভিভাবকের হিসাব অনুযায়ী ফেল করেনি বরং "লেটার নম্বর" পেয়েছে। অন্য এক অভিভাবক বলেছেন, তাঁর ছেলে ভূগোল বিষয়ে যত নম্বরের উত্তর দিয়েছে বলে পরীক্ষার পর জানিয়েছিল, ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে যে তার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে ভৌতিকভাবে। গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষকরা বলেছেন, তাঁরা ১০ বছর তাঁদের ছেলেদের পড়িয়েছেন, এদের মেধা সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত, বোর্ডের প্রশ্ন তারাও তৈরি করেন, পরীক্ষার উত্তরপত্র তাঁরাও মূল্যায়ন করেন, প্রধান পরীক্ষক হিসাবে বোর্ডের অধীনের স্কুলের ছাত্রদের মূল্যায়ন করা হাজার হাজার খাতা তাঁদের কাছে আসে এবং তাঁরা ভাল ছাত্রদের খাতাগুলো দেখার সুযোগ পান, আর তার আলোকেই তাঁরা বলেছেন, ছাত্রদের ফলাফল আমাদের হতবাক করেছে। প্রধান শিক্ষক বলেছেন, আমার স্কুলের এবারের ফলাফল আমাকে হতাশ করেছে অথচ ১৯৬২ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর এটাই ছিল সর্বোত্তম ব্যাচ।

> *বোর্ড যে অর্ডিন্যান্সে গঠিত হয়েছে সে অর্ডিন্যান্সই আমাদের অগ্রসর হবার পথে বাধা। এমনকি আইন করে পরীক্ষার খাতাও পুনঃপরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার ভাষায় 'Re-examination is strictly prohibited in the ordinance.' তাহলে বলতে হয়, দেশের আইন ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষকদের অধিকারের protection দিচ্ছে না। বোর্ডের কাছে এই তিন গোষ্ঠী জিম্মি। তবে কি এই বহুল আলোচিত গোঁজামিল দেয়া ফলাফলই আমাদের মেনে নিতে হবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই? এর জন্য কি বিচার চাওয়া যাবে না বা এর কি বিচার পাওয়া যাবে না?*

দৈনিক ইত্তেফাক এবং বাংলা বাজার পত্রিকায় যথাক্রমে গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল ও ক্যাডেট কলেজসমূহের ফলাফল সম্পর্কে ২টি দীর্ঘ অথচ অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন (৮/১০/৯৪ ও ১৭/১০/৯৪) প্রকাশিত হয়েছে। ইত্তেফাকে রিপোর্টটি প্রকশিত হবার পরদিনই ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের একটি প্রতিবাদ ছাপা হয়েছে। অবশ্য জনকণ্ঠ, বাংলা বাজার পত্রিকা, সংবাদ ও অবজারভারসহ অন্যান্য পত্রিকায় এবারকার পরীক্ষা সংক্রান্ত খবর, চিঠি বা নিবন্ধের কোন প্রতিবাদ আমার নজরে আসেনি। শুধুই এক স্থানে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেছেন, বুদ্ধি করে কোড নম্বর ব্যবহার করায় অভিভাবকরা পরীক্ষকের বাড়ির খোঁজ করতে পারেননি এবার। এ ধরনের একটি চমৎকার খবর দেবার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তবে জানতে ইচ্ছা করে, অভিভাবকরা পরীক্ষকদের ঠিকানা কোত্থেকে সংগ্রহ করেন?

ভিন্ন ভিন্ন সময় দুটো পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে ক্যাডেট কলেজ এবং ল্যাবরেটরি স্কুলের মেধা তালিকার ছাত্রদের সাথে বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের একটি তুলনামূলক পরীক্ষার প্রস্তাব এসেছে।

ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্টের এক স্থানে ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের জনৈক শিক্ষকের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, "আমরা আমাদের ছাত্রদের জানি, চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি বোর্ড যাহাদের মেধা তালিকায় স্থান দেখাইয়াছে, তাহাদের সহিত আমাদের টেস্ট পরীক্ষায় ১-২০তম স্থান অধিকারীরা পুনরায় পরীক্ষায় বসিলে আমাদের ছেলেরাই ভাল করিবে।" তিনি উক্ত রিপোর্টে আরও বলেছেন, "আমাদের কিছু মেধাবী ছাত্রের কোন কোন বিষয়ের নম্বর বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয় এবং তা আমাদের বিশ্বাস করিতে হইতেছে।" অভিযোগ রয়েছে যে, বুয়েট কম্পিউটার সেন্টার থেকে যে মেধা তালিকা মন্ত্রণালয়ে (বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট নয়) সরবরাহ করা হয়েছে তার সাথে প্রকাশিত তালিকার গরমিল রয়েছে।

মেধা তালিকা সম্পর্কে অপর অভিযোগটি হলো : মেধা তালিকা প্রণয়নের জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এবার বিষয়ভিত্তিক প্রত্যেক প্রধান পরীক্ষকের নিকট থেকে প্রথম ২০ জনের উত্তরপত্র পুনরায় মূল্যায়নের জন্য নেয়া হয়নি।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট, চিঠিপত্র এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের প্রথম পাবলিক এগজামিনেশনটি কর্তৃপক্ষ তাড়াহুড়া করে একটি নতুন পদ্ধতিতে গ্রহণের অসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তাতে কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে যে দুর্ভোগ ও দুর্যোগ নেমে এসেছে এবং তাদের অভিভাবকদের যে মানসিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আইনের বিধানে এ ধরনের অপরাধের কথা উল্লেখ নেই। তাই এর জন্য শাস্তির মাত্রাও আইনের বইতে লেখা নেই— এ বক্তব্য একজন ব্যারিস্টারের। কয়েকজন অভিভাবক মামলা দায়েরের জন্য তার শরণাপন্ন হলে তিনি জবাবে আরও বলেন, বোর্ড যে অর্ডিন্যান্সে গঠিত হয়েছে সে অর্ডিন্যান্সই আমাদের অগ্রসর হবার পথে বাধা। এমনকি আইন করে পরীক্ষার খাতাও পুনঃপরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার ভাষায় 'Re-examination is strictly prohibited in the ordinance.' তাহলে বলতে হয়, দেশের আইন ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষকদের অধিকারের protection দিচ্ছে না। বোর্ডের কাছে এই তিন গোষ্ঠী জিম্মি। তবে কি এই বহুল আলোচিত গোঁজামিল দেয়া ফলাফলই আমাদের মেনে নিতে হবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই? এর জন্য কি বিচার চাওয়া যাবে না বা এর কি বিচার পাওয়া যাবে না?

ইত্তেফাক, সংবাদ, জনকণ্ঠ, বাংলাবাজার পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত ছেলের অভিভাবক এ পর্যন্ত নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট অংকের ফি দিয়ে তাঁদের ছেলেদের বিভিন্ন বিষয়ের খাতা পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করেছেন। যতদূর জানি এসব আবেদন স্বীকৃত অবস্থায় অযত্নে রয়েছে বোর্ড অফিসে। কারণ এবার এত অসঙ্গতির প্রতিকার করা দুরূহ কাজ। আর তাই সযত্নে কাজটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েকজন প্রধান পরীক্ষকের সাথে আলাপ করেই আমার অন্তত এটাই মনে হয়েছে। কারণ তাদের কাছে এ পর্যন্ত কোন খাতা Requisition করা হয়নি।

উল্লিখিত আলোচনায় এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অবিশ্বাস্য রকমের ও পরিমাণের ভুলত্রুটি এবং অসঙ্গতির দায়দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারবেন না। প্রায় ৭ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল চূড়ান্ত করার কাজে যে পরিমাণ দক্ষ লোকবল প্রয়োজন ছিল, বোর্ড বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার যোগান দিতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ ব্যর্থতার পরিমাণ ও চরিত্র দুটোই সীমা-পরিসীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর এর পরিণতিতে দেশজুড়ে অনেক মেধাবী ছাত্রের সর্বনাশ হয়েছে। তারা অন্যায়ভাবে তাদের ন্যায্য নম্বর প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার ফলে এমন ভুলভ্রান্তির কারণগুলোর মধ্যে দেশব্যাপী শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে সীমিত সংখ্যক শিক্ষক (যাদের মধ্যে আবার বিপুল সংখ্যক অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ শিক্ষক) দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন (ক্ষেত্র বিশেষে এসব শিক্ষক তাঁদের স্ত্রী-সন্তান দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করিয়েছেন), পরীক্ষকদের বেশ কয়েকস্থানে গোল্লা ভরাট করার কাজে অনিচ্ছাকৃত ভুল অন্যতম। এসব ভুল হতেই পারে। তাই এসব ভুলের দায়দায়িত্ব স্বীকার করা দোষের কিছু নয়। কারণ এ ভুলের জন্য তো একজন ছাত্রের জীবনে এতবড় ক্ষতি মেনে নেয়া যায় না। আর ভুল সংশোধনের সুযোগ তো রয়েছে। ভুল সংশোধন তো দোষের কিছুও নয়।

তাই, আমার সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, ক্যাডেট কলেজ এবং গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলের যে সব মেধাবী ছাত্রের গুটিকয়েক উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার আবেদন জানান হয়েছে সেগুলো বিবেচনা করে সন্দেহের অবসান ঘটানো দরকার। এতে হুমকির সম্মুখীন বোর্ডের এত বছরের নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হবে, অক্ষুণ্ন থাকবে মর্যাদা। তাতে বোর্ডের লাভ বৈ ক্ষতি হবে না। এ ছাড়া বিপুল সংখ্যক ছাত্রের উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার আবেদন বিবেচনার জন্যও কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ রইলো।